অধ্যায় ১১ : দৌলত কাজি'র 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না'

বিন্যাসক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১১.২ পরিচিতি
১১.৩ 'লোরচন্দ্রাণী' কাহিনি অংশ
১১.৪ চরিত্র নির্মাণ
১১.৫ কবি দৌলত কাজির কবি-কৃতিত্ব
১১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১১.৮ অতিরিক্ত পঠন
১১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১১.১০ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন-

- আরাকান সাহিত্যের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সপ্তদশ শতকের কাব্য হওয়া সত্ত্বেও মানব প্রেমের কাহিনি যে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
- কবি দৌলত কাজীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.২ পরিচিতি

মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে মানবিকতার সাহসী পদক্ষেপ যে সাহিত্য চর্চা দেখাতে পেরেছিল তার মধ্যে রোসাঙ্গ রাজসভার সাহিত্য অন্যতম। আর এই ব্যতিক্রমী সাহিত্যচর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন দৌলত কাজী স্বয়ং। রাজ সভার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাহিত্য নির্মাণ করতে বসে দৌলত কাজী মূলত মানব মানবীর জাগতিক প্রেমকে আশ্রয় করে কাব্য ভুবন রচনা করেছেন। মধ্য যুগের কথাকারদের থেকে দৌলত কাজী তাঁর 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যের মধ্য দিয়ে যে স্বতন্ত্র নিদর্শন গড়ে তুলেছেন তা তাকে শতাব্দী উত্তর স্মরণীয় করেছে।

১১.৩ 'লোরচন্দ্রাণী' কাহিনি অংশ

রোমান্টিক আখ্যানকাব্য 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না'র যে অংশটুকু দৌলত কাজী রচনা করেছেন, সেটিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, লোর-চন্দ্রাণীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েন সমন্বিত অম্লমধুর প্রেমকাহিনি; এবং দ্বিতীয়ত, স্বামীর বিরহে কাতর হওয়া সত্ত্বেও ময়নার সতীত্ব রক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নারী হয়ে উঠার গল্প । একটি মাত্র কাব্যের মধ্যে দু'টি কাহিনির অবস্থান এটাই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নয়। তবে কাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ দিক হল যে, এখানে দু'টি কাহিনি নানান কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন পথে যাত্রা করেছে।

কাব্যটির কাহিনি সংক্ষেপ এরকম - গোহারী দেশের রাজা মোহরা। তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণীর সঙ্গে ভাগ্যদোষে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয়। এতে চন্দ্রাণী দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। অপরদিকে, নৃপতিনন্দন রাজা লোরকের সঙ্গে সতীসাধ্বী ময়নাবতীর বিয়ে হয় এবং তারা সুখে দিন কাটাতে থাকে। ঘটনাক্রমে রাজা লোরক বনে মৃগয়ায় গিয়ে এক যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ করার জন্য গোহারীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং সেখানে গিয়ে একে অপরকে দেখে আকৃষ্ট হয়। এরপর লোর-চন্দ্রাণী দেবী মন্দিরে সাক্ষাৎ করে এবং উভয়ে মিলিত হয়। এসব ঘটনা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বামন একসময় শুনতে পেলে লোরকের বিনাশ ঘটাতে সে বনপথ রোধ করে ধরে। এসময় বামন ও রাজা লোরকের মধ্যে যুদ্ধ হয়, বামনের পরাজয় ঘটে ও সে মারা যায়। এরই মধ্যে চন্দ্রাণীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে যোগীবর তাকে বাঁচিয়ে দেয়। রাজা লোরক তখন চন্দ্রাণীকে বিয়ে করে গোহারী দেশের রাজা হয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে এবং ময়নার কথা একেবারেই ভুলে যায়।

অন্যদিকে স্বামীর বিরহে ময়না অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। ময়নার জীবনের এই দুঃখ-যন্ত্রণা দৌলত কাজী বারমাস্যার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন চিত্রকল্পের সাহায্যে। স্বামী সম্পর্কে ময়নার কিছুই ধারণা নেই, তাই সে নিত্য হরগৌরীর পূজা করে। এইসময় মালিনীর সহায়তা নিয়ে ছাতন ময়নাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেও ময়না নিজের সতীত্ব দৃঢ়ভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এতটুকু লিখে দৌলত কাজী পরলোকগমন করেন। আমাদের এই পর্যন্তই আলোচ্য বিষয়।

কাব্যের কাহিনি আলোচনায় দেখা যায় যে, কাব্যটি মানবিক প্রেম দ্বন্দ্বের কাহিনি। এর একদিকে রয়েছে চন্দ্রাণী ও অপরদিকে ময়নাবতী দু'জন নারী চরিত্র। আর এই দুই নারী চরিত্রের মাঝখানে রয়েছে রাজা লোরক। তবে চন্দ্রাণীই প্রধান নায়িকা। সে যৌবন পরিপূর্ণা এক রূপসী নারী। কাব্যটিতে রাজা লোরকের সঙ্গে তারই প্রেমের চড়াই-উতরাই নানান কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে এবং উভয়েই লাভ করেছে প্রেমের অম্লমধুর স্বাদ। চন্দ্রাণী বীর্যশালী বামনের স্ত্রী, কিন্তু বামন নপুংসক হওয়ার কারণে কামকেলিতে অসমর্থ –

"সর্বগুণে সম্পূর্ণ যৌবন বীর্যবল।
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।।" (যোগীর আগমন)

ফলে চন্দ্রাণী বামনের বীরত্বের কথা মাথায় রেখেও নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে পরপুরুষকে ভজেছে– সামাজিক নীতিকে এক মুহূর্তের জন্যেও তোয়াক্কা করেনি। তার কাছে প্রেম শুষ্ক মরুভূমি নয়, ভোগের মধ্য দিয়েই সে প্রেমের স্বাদকে পেতে চেয়েছে। তাই চন্দ্রাণীর স্বামী থেকেও নেই –

"স্বামীহীন নারীর কি ফল সংসার।
বিফলে বঞ্চয় নিশি রমণী যাহার।।"
(চন্দ্রাণীর খেদ)

ভাগ্য বিড়ম্বিত চন্দ্রানীর কাছে এটা সত্যিই ভাগ্যের পরিহাস, কিন্তু সে কখনই এই দুর্ভাগ্যের কাছে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেনি। বরং সে এখানে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলির রাধার মতো কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে। চন্দ্রাণী চরিত্রের এমন কার্যকলাপ অনেকটাই আধুনিকা নারীর সমগোত্রীয় করে তুলেছে।

সমাজের অপরিহার্য অংশ যেমন মানুষ, তেমনি প্রেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শরীর। শরীর ছাড়া প্রেম পূর্ণতা পায় না। চন্দ্রাণীর প্রেম অবশ্যই দেহনির্ভরই। এর মূল কারণ চন্দ্রাণীর পেটের খিদে মিটলেও শারীরিক দিক থেকে সে ছিল অতৃপ্ত। তাই রাজা লোরকের সঙ্গে তার প্রেমেরও একটা আলাদা মূল্য আছে। বলা হয়, লোরকের সঙ্গে চন্দ্রাণীর প্রেমের মূলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কাব্যটিকে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চন্দ্রাণীর প্রেমের পেছনে একটা বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। অবশ্য সামাজিক নীতির দিক থেকেও সে বেশ সচেতন ছিল। চন্দ্রাণী চরিত্রের নানান উক্তি আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় –

"তিল সুখ লাগিয়া হারাইলুঁ জাতিকুল।
ঘাটেত বসিয়া নৌকা ডুবাইলুঁ মূল।।"
(লোরচন্দ্রানীর পলায়ন)

পরবর্তী সময়ে, বামনের সঙ্গে রাজা লোরকের যুদ্ধ, বামনের পরাজয় ও মৃত্যু – এসব ঘটনা তার সম্মুখে ঘটলেও নিজের বঞ্চিত জৈববৃত্তির তাড়নার ফলেই সে সহ্য করেছে সমস্ত কিছু। স্বাভাবিকভাবেই লোর-চন্দ্রাণীর প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কখনও তাদের জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে, আবার কখনও সেই প্রেমই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। ফলে 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যের কাহিনি এক গরলামৃত প্রেমদ্বন্দ্বের কাহিনি হিসেবে গড়ে উঠেছে।

লোরের বিবাহিতা স্ত্রী ময়নাবতীও এই কাব্যের আরেকজন নায়িকা। রাজকুমারী ও রাজকুলবধূ হিসেবে তার রূপ ভুবনবিজয়ী –

"রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবনবিজয়ী কন্যা রূপেতে পার্বতী।।"

কিন্তু ময়নার অজস্র গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও রাজা লোর বনবিহারে গিয়ে চন্দ্রাণীকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করে চন্দ্রাবতীর রাজ্যে থেকে যায়। এরূপ অবস্থায় ময়নাবতীর যে খেদ, যে বিরহজ্বালা ও আর্তির কথা আমরা জানতে পারি তা তার বিভিন্ন উক্তি, তার আচার-ব্যবহারে ফুটে উঠেছে। আষাঢ় মাস থেকে ময়নার বিরহ-জ্বালার চিত্রকে দৌলত কাজী তুলে ধরেছেন –'

"প্রথম বারিষা দেখ প্রবেশে আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়য় অতি গাঢ়।।"

-ক্রমে শ্রাবণ মাস এসেছে, কিন্তু তবুও ময়নার বিরহ জ্বালার উপশম হয়নি। এভাবে প্রতিটি মাসে ময়নার বিরহ বেদনাতুর হৃদয়ের কথা কবি 'সতীময়না' কাব্যে তুলে ধরেছেন। কার্তিক মাসের ঘটনা সম্পর্কে মালিনী ময়নাকে বলেছে—

'কার্তিকেত কান্ত তোর গেল দিগন্তর।'
অগ্রহায়ণে হতাশ হয়ে বলে–
'অন্তরে আগুন দিয়া দিগন্তরে কান্ত।'

কিন্তু তবুও ময়না অন্য কোন পুরুষের কথা এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেনি। কারণ, তার কাছে তার স্বামীই একমাত্র পুরুষ। এজন্য মালিনীর মাধ্যমে ছাতনের পাঠানো প্রস্তাবকে ময়নাবতী ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মালিনীকে বলেছে –

"মালিনী না বোল অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসী তেজি সতীত্ব মতি
লোর প্রেমে করাওসি হানি।।"

শুধু তাই নয়, মালিনীকে 'পাপিনী', 'পাতকী', 'ঘাতকী' বলতেও ময়না কুণ্ঠাবোধ করেনি। এতকিছুর পরেও মালিনী যখন নাছোড়বান্দা তখন ময়না নীচু সুরে নিজের অন্তর বিদীর্ণ ভাবের কথাই জানিয়েছে-

"মালিনী মোর মনে আন নাহি তায়।
নয়নের জল দিয়া সে পদ ধোলাইমু গিয়া
যদি বিধি সে বন্ধু মিলায়।।"

ময়নার এই উক্তি থেকে স্বামীপ্রেমের প্রতি তার একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামী বিচ্ছেদের কারণে প্রতিটি নারীহৃদয় দুঃখের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়। এরূপ অবস্থায় সেই দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে যদি কেউ ঘি ঢেলে দেয় তাহলে সেই নারীর বিরহ-জ্বালা আরও শতগুণে বেড়ে উঠে। এসময় কোন নারীর পক্ষে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। ময়নার জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল, দুঃখের দাবানলে মালিনী ঘি ঢেলেছিল। কিন্তু ময়না তবুও টলেনি সেইরকম চরম মুহূর্তেও সে অটল থেকেছে এবং বছরের প্রতিটি মাসে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও স্বামী লোরকের ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনেছে। ময়নাবতীর এহেন কার্যকলাপ দেখে মনে হতে পারে সতীত্ব রক্ষা করাই তার প্রধান কাজ আসলে তা নয়। তার হৃদয়েও প্রেম রয়েছে, কামনা বাসনা রয়েছে, স্বামীহীন অবস্থায় সে-ও মদনজ্বালায় ছটফট করেছে। কিন্তু সবকিছুই সে সংযমের মাধ্যমে পেতে চেয়েছে। "যৌবন-বেদনা

তার আছে; স্বামীসঙ্গ তার কাম্য; আবার সতীত্বধর্ম আছে; এর জন্য সে জীবনপাত করতে প্রস্তুত কিন্তু বিপদগামিনী হতে রাজী নয়।"

দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যের কাহিনি এবং চন্দ্রাণী ও ময়নার চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা গেল যে, চরিত্র দুটির মন-মনন-মেজাজ-মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চন্দ্রাণীর প্রেমে কামনা বাসনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। কারণ, শক্তিশালী স্বামী বামন থাকলেও সে চন্দ্রাণীর মদনজ্বালা প্রশমিত করতে অক্ষম। তাই সমাজকে পেছনে ফেলে বাড়ির দরজাকে অতিক্রম করে সে রাজা লোরকে সাদরে গ্রহণ করেছে। চন্দ্রাণী চরিত্রের এই স্বভাববৈশিষ্ট্য আধুনিক সাহিত্যের যেকোনো নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতীয় সমাজে একজন বধূর বিনা অনুমতিতে ঘোরা-ফেরার অধিকার থাকে বাড়ির দরজা পর্যন্তই। বাড়ির বাইরে বের হতে গেলে তাকে স্বামী বা অন্য কোন গুরুজনের কাছে অনুমতি নিতে হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বের হতেই দেওয়া হয় না। সমাজে আদর্শ নারীরূপে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বাড়ির দরজাকে ডিঙিয়ে পরপুরুষ তো দূরের কথা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজেও বিনা অনুমতিতে বাড়ির বাইরে যায় না। ময়না এরকমই বাঙালি ঘরের এক 'আদর্শ সতীনারী'। তার সতীত্বের কারণেই কাহিনির অগ্রগতি এখানে সম্পূর্ণভাবে গৃহমুখীন হয়ে পড়েছে।

দৌলত কাজীর কাব্যের পরে রচিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' (১৬৪৬) কাব্যে রাজা রত্নসেন-নাগমতী-পদ্মাবতীকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি গড়ে উঠেছে, যেখানে নাগমতী বা পদ্মাবতীর প্রেম কখনো দুই ভিন্ন পথে এগোয়নি বা একে অপরকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেনি উভয়ের প্রেম সেখানে সমান মহিমা পেয়েছে। কিন্তু দৌলত কাজীর কাব্যে প্রেমের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দু'জন নারী প্রেমের আসল স্বাদ দু'ভাবে পেতে চেয়েছে একজন ঘর থেকে বাইরে গিয়ে, অপরজন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি কাব্যের মধ্যে কাহিনির অগ্রগতির এরকম দ্বিমুখীনতা কাব্যটিকে অভিনব করে তুলেছে।

বর্তমান যুগের উপন্যাসে দেখা যায় যে, একদিকে নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রেমের দ্বন্দ্ব ও অন্যদিকে সামাজিক কারণে বিবাহিত নারীদের আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখা অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষা করার মতো ঘটনাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করে, যা দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ড. মহুয়া যন্নিগ্রহী সম্পাদিত 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের 'প্রবেশক' অংশে অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন। "লোরচন্দ্রানী' মানবিক প্রেমদ্বন্দ্বের কাহিনি।... অনেকটা একালের উপন্যাসের মতো। নেহাৎ পদ্যে লেখা, নইলে এটিকে মধ্যযুগের ভালো প্রেমমূলক উপন্যাস বলে চালানো যায়।"

অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যে একদিকে লোর-চন্দ্রাণীর মধ্যে প্রেমের টানাপোড়েন আর অপরদিকে ময়নাবতীর সতীত্ব রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়– এই দুটি ঘটনাকে অবলম্বন করে কাহিনির পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হবার বিষয়টি আধুনিক সাহিত্যেরও অন্যতম অবলম্বন।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। লোরচন্দ্রাণী কাব্যের কাহিনির সারসংক্ষেপ লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৪ চরিত্র নির্মাণ

১১.৪.১ সতীময়না

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সমীরের মুখ দিয়ে বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত।" এই কথা দৌলত কাজীর 'সতীময়না' কাব্যের নারীচরিত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে পারে। এই চরিত্রগুলি সকলে অতিমাত্রায় জীবন্ত ও গতিশীল হওয়ায় কাব্যে বাস্তবতাগুণ ফুটে উঠেছে।

এই কাব্যে সতীত্বের আদর্শপুষ্ট চরিত্র ময়না। এই চরিত্রের মধ্যে প্রেমের এক দীপ্ত শিখা সতীত্ব ও পাতিব্রত্যকে অবলম্বন করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাব্যবিন্যাসে কবি দৌলত কাজীর এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি অনুচ্চারিত থাকেনি। 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি'-অংশে কবি তারই নির্দেশ রেখেছেন—

"শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।
ভারতে পুরাণে সত্য, সত্য সে বাখানে।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে।।
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী।।"

সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকে ময়না চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ সত্যের বিশ্বাসে যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থির অচঞ্চল থাকাই ময়নার সাধনা ও প্রেরণা। দেবী চরিত্রের সঙ্গে তার চরিত্রের তুলনা করে কবি ময়নার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার রূপে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া উজ্জ্বলতা নেই, একটি স্নিগ্ধতা বিরাজমান। ময়নার বাইরের এই অনুপম রূপ ও সৌন্দর্য ময়নার অন্তরকে প্রেম সুধায় জারিত করে। কল্যাণময়ী প্রেমের প্রতীক এই নারীর আচারে-ব্যবহারে সংসারে শ্রী ও মঙ্গল বিরাজ করে।

স্বামী লোর তার প্রতি বিমুখ হলে ময়না অসহনীয় যন্ত্রণায় তার প্রতীক্ষা করে। স্থির বিশ্বাস জাগিয়ে রাখে হৃদয়ে। অন্য রমণীর রূপে আকৃষ্ট রাজা লোরের পত্নী স্বামী সান্নিধ্য বঞ্চিত জীবন মেনে নেয় বাধ্য হয়ে। কিন্তু গৃহকর্মে ও গৃহধর্মে নিযুক্তা ময়না সত্যনিষ্ঠায় এক বিন্দু আঁচড় পড়তে দেয় না। স্বামী বঞ্চনায় বঞ্চিত হয়েও কোনোভাবেই নিজের ধর্ম ও বিশ্বাসকে লঙ্ঘন করে হৃদয়ের চপলতা প্রকাশ করে না। পরপুরুষের প্রতি আসক্তি তার মানসচিত্তে উঁকি দেয় না। উমা-পার্বতীর মতো তার তপস্যা ময়নাকে দেবীর সমগোত্রীয় করে তোলে।

সতীময়না'-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ময়নাকেই বিরহের আগুনে পুড়িয়ে কবি যোগিনীরূপে অঙ্কন করেছেন। বারমাস্যা'-র দীর্ঘ অংশে দেহ ও পরিবেশ সচেতন কিন্তু বিশ্বাসে স্থির, লক্ষ্যে অবিচল ময়না চরিত্র আমরা পাই। শরীরের ক্ষুধা উপেক্ষা না করে ময়না বাস্তব জগতের নারীর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

"শ্রাবণেত গগনে সঘন ঝরে নারী।।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ।।
মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কয় যামিনী কম্পয় মোর দেহা।"

ময়নার দেহের দাবির প্রতি এ আকুলতা স্বাভাবিক। তার পতি বর্তমান তাই মিলনের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা ময়নাকে দেহবাদী নারী না করে স্বামী অনুরাগিনী নারীতে পরিণত করেছে। ময়না চরিত্রের অসাধারণত্ব দেহ ভাবনার প্রকাশে নয়, সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে কঠিন সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রণে। তার চোখে পরপুরুষসঙ্গ অনুচিত, অসহনীয় ও অকল্পনীয়-

"গরম সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ !!"

ময়নার এই ভাবনা জীবনের সত্য আলোকচেতনা থেকে স্ব-উৎসারিত। ছাতন কুমারের প্রলোভন বার্তায় মাঝে মাঝে দেহ ও মনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে যদিও, কিন্তু তা ক্ষণিকের বুদবুদের মত। জেগে উঠেই এই দেহচেতনা হারিয়ে গেছে, পরাজিত হয়েছে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সংযমের গভীর বোধের কাছে। সংকল্পের এই দৃঢ়তায় স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা বিরহকাতরা ময়না। সত্যের সন্ধানে সে বিশুদ্ধ প্রেমেরই আরতি করেছে।

"নিজ রাজ্যে ময়নাবতী
দেব ধর্ম পূজে নিতি
স্বামি-বর মাগে সর্ব কালে।"

সতী ময়নার একটাই লক্ষ্য স্বামীর সঙ্গ সুখে জীবন কাটান। রাজার স্ত্রী হিসেবে ময়না চাইলেই হয়ত যুদ্ধ সংঘটিত করে চন্দ্রাণীর কবল থেকে স্বামীকে উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু ময়নার মতো রমণীর পক্ষে সেটা যথার্থ পথ নয়। কবি তা চাননি বলেই লোরের কামনা ও ভোগের রাজ্যে উপস্থিত করেননি ময়নাকে। তাকে বিরহ ব্যথার যন্ত্রণায় সাধ্বীরূপ দান করেছেন। তপশ্চর্যার এই মঙ্গল ও সত্য স্থান চিরকাল ভোগ ও চঞ্চল কামনার ঊর্ধ্বে। সীমাহীন প্রতীক্ষার এই সাধনাই একদিন ভোগের কবল থেকে রাজা লোরকে ময়নার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। কামনা নয় শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছিল প্রেম।

বিশ্বাস ও সত্যের মানদণ্ডে এই চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন কবি দৌলত কাজী। আলাওল'ও ময়নার চরিত্রের জয়গান করেছেন। এক সুরে বাঁধা ময়না চরিত্র তবু static চরিত্রে পর্যবসিত হয়নি। সত্য বিশ্বাস ও অবিচল প্রতীক্ষার প্রতিমূর্তি ময়না মাঝে মাঝেই কম্পিত হয়েছে দেহের তাড়নায়, সতিনী চন্দ্রাণীর প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণে।

"যে দুঃখ মোহর পরে পড়িয়াছে ধাই।

সেই দুঃখ পড়েকি গিয়া সতিনীর ঠাঁই।।"

'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে' যন্ত্রণাদগ্ধ রাধার এই উচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায় ময়নার উচ্চারণ। ময়না চরিত্র গড়ে তুলতে গিয়ে বৈষ্ণব পদাবলির জগতের রাধার চরিত্র বৈশিষ্ট্যেই আদ্যোপান্ত প্রভাবিত হয়েছেন কাজী। রাধা চরিত্রের মূল ভাব বীজ দৌলত কাজীর হাতে যেন ময়নার মূর্তি ধারণ করেছে। যদিও তাই সতিনীকে গালমন্দ করছে ময়না, প্রতিনিয়ত বিরহ যন্ত্রণায় পিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পরপুরুষের প্রসঙ্গ আনলেই দূতীকে গালাগালি করে সেই যোগিনীর বেশকেই স্বীকার করে নিচ্ছে ময়না। যোগিনী ময়নার সেই মূর্তি মালিনী রত্নার বক্তব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

"মলিন চিকুর তোর মলিন অম্বর।
মলিন দেখয় তোর চারু কলেবর।।
নয়নে অঞ্জন নাহি সীযেত সিন্দুর।
ত্রিভঙ্গ খোপার মাঝে না দেখি তোহোর।।"

স্বামীর প্রতি প্রেম অগ্নিশিখার মত বিরাজমান ময়নার অন্তরে। এই সত্য আসলে তার অন্তরের সুদৃঢ় সংস্কার। শত প্রলোভনও তাই তাকে টলাতে পারেনি। এই সতীত্ব ধর্মকে কবি অনবদ্যরূপে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছেন ময়নার চরিত্রে। বাস্তব বিচারে ময়না হয়তো সক্রিয় নয়, চন্দ্রাণীর মত নিজের তৃপ্তির প্রয়োজনে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনে দুঃসাহসিক ও অসামাজিক প্রচেষ্টা তার নেই। আসলে ময়না ও চন্দ্রাণী ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। তাই চন্দ্রাণীর মধ্যে রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বলতা বেশি আর ময়নার চরিত্রে নীতির, মূল্যবোধের স্বচ্ছতা ও গভীরতা বেশি। আলাওল রচিত অংশে, নীতি ও সংযমে সুস্থির কিন্তু বাস্তবের আঘাতে চঞ্চল সজীব ময়নারই দেখা পাওয়া যায়

দৌলত কাজী ও আলাওল উভয় কবি সতীত্ব দেদীপ্যমান ময়নাকেই জীবন্ত করে অঙ্কন করেছেন। কবি দৌলত কাজী জীবিত থাকলে ময়না চরিত্র হয়তো আরও মাধুর্যপূর্ণ, 'সতীত্বধর্মে অবিচল নারী চরিত্রের পরিণতি লাভ করত। কবি আলাওলও ময়না চরিত্রের পূর্বাপর সঙ্গতিবিধান করেছেন। ময়না চরিত্রের ক্ষেত্রে উভয় কবি মিলে ময়না চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। আলাওল ময়না চরিত্রকে আর একটু এগিয়ে দিয়েছে একটি বিশেষ ভাবনায়। চূড়ান্ত প্রতীক্ষার পরও স্বামীর প্রত্যাবর্তন না ঘটায় শুক পাখি সহ এক ব্রাহ্মণকে রাজা লোরের চেতনা ফেরাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে। বাস্তব মানুষের অগ্রবর্তী ভাবনায় ময়না এই অংশে একেবারে মাটির কাছাকাছি চলে আসা চরিত্র এবং এভাবেই তার পূর্ণতা।

১১.৪.২ চন্দ্রাণী

সুফি প্রেমের আদর্শ দৌলত কাজীকে প্রেরণা যুগিয়েছে দেহ ও দেহাতীত প্রেমের সমন্বয় সাধনে। মঙ্গল ও সত্যের প্রতি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবির সমর্থন থাকলেও কবি হৃদয়ের আকুতি ছিল অন্য ছবি অঙ্কনের প্রতি। স্পষ্টভাবে বলতে হয়, দৌলত কাজীর কবি হৃদয় বিভাজিত হয়েছিল দুই শ্রেণির প্রেমের প্রতি। কবির নৈতিক সমর্থন ছিল সতীত্বের মহনীয়তার উজ্জ্বল ময়নার প্রতি। কিন্তু প্রাণের সমর্থন ছিল কামনা বাসনা সম্পন্না নারী, রোমান্টিক মেজাজের চন্দ্রাণীর দিকে। কোন সংশয় নেই যে, রোসাঙ রাজসভার দরবারী রুচি দৌলত কাজীর কাব্য পরিকল্পনার পেছনে কাজ করেছিল। রাজসভার রুচি মানেই সবসময় ভোগের উন্মত্ত প্রবাহ, কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস এরকম নয় যদিও, তবে রাজা ও রাজপুরুষেরা শুধু সতী লক্ষ্মী

স্ত্রীর সাহচর্যই একমাত্র আদর্শ বলে মনে করতেন না। নারীর সৌন্দর্য ও নারী শরীর ভোগের মধ্যে রাজারাজড়ারা কোন বিবেকের তাড়না অনুভব করতেন না। 'সতীময়না' কাব্যে চন্দ্রাণী চরিত্রটি পরপুরুষের ভোগের সামগ্রী না হয়ে নিজের অতৃপ্ত যৌবন বাসনার প্রচণ্ড তাগিদে ভোগের রাজ্যকে নিজেই ডেকে এনেছিল। এ কথা মেনে নিতে হবে, রোমান্টিক প্রেমের অ্যাডভেঞ্চার-পূর্ণ ঘটনাবলির মধ্যে পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চন্দ্রাণী। এই নারী কামনা রাজ্যের রানি নয়। বরং দেহগত যে বাসনা স্বামীর সহবাসহীনতায় অপরিতৃপ্ত, তার প্রভাবই চন্দ্রাণী চরিত্রকে তাড়িত করেছে। ময়নাকে কবি দেবী পার্বতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার সতীত্ব ত্যাগ ও তিতিক্ষার। অসাধারণ শিল্পবোধে সেই একই কবি ইন্দ্রপত্নী শচীর সঙ্গে তুলনা করেছেন চন্দ্রাণীর স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্ররানি শচী কলাবতী।

চন্দ্রাণী অসাধারণ রূপসী রাজকন্যা, তার বিয়েও হয় মহাবীর বামনের সঙ্গে। কিন্তু এই বীর বামন সঙ্গমে অসমর্থ, 'রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।' ভরা যৌবনের এই ব্যর্থতা কিন্তু চন্দ্রাণীকে কামময়ী করে তোলে না। তবে বিবাহ অনুসারী যে মিলনের স্বপ্ন নারী দেখে, তা প্রতিহত হওয়ার একটা হাহাকার তার মধ্যে জেগে ওঠে। বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে বলতে হয়।

"সম্ভোগে শিশুর প্রায়, জ্ঞানে নহে আন।।
পশুমত স্বামী মোর, বুঝিলু ধরণ।
শুন যদি তাকে মোকে করাও মিলন।
গরল ভক্ষিয়া মুই তেজিমু জীবন।"

স্বামীর এই অক্ষমতা অন্যের কাছে বলতে যাওয়া শুধু স্বামীর নয়, নিজেরও অপমান। এমন অবস্থা দেহসর্বস্ব নারী ছাড়া অধিকাংশ নারীই প্রেমের আলোকে অতিক্রম করে যেতে চায়। চন্দ্রাণীও হয়ত তাই করত। কিন্তু বামন সঙ্গমে অসমর্থ শুধু নয়, সে অসভ্য, অমার্জিত, প্রেমবর্জিত। এমন স্বামীর প্রসঙ্গে চন্দ্রাণীকে বলতে হয়।

"পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।।
মুখ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।"

সর্বগ্রাসী কামনা নয়, বিবাহিত চন্দ্রাণী স্বামীর কাছ থেকে প্রেম কামনা করেছিল। কিন্তু বামনের কাছ থেকে সবদিক থেকে আশাহত হয়। এমন অবস্থার মধ্যেই কিন্তু চন্দ্রাণী তার লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করে—

"ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।
সখীগণ সঙ্গে তথা থাকিমু কৌতুকে।।"

দেহগত কামনার প্রচণ্ড পীড়নই চন্দ্রাণীকে রাজা লোরের প্রতি আকর্ষণ করে তা নয়। চন্দ্রাণী নিজে অসাধারণ রূপসী। এই রূপ সচেতনাই তার মধ্যে বন্ধ পক্ষ বিহঙ্গের মত রূপতৃষ্ণাকে লালিত করেছে। দৌলত কাজী চন্দ্রাণী চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন একে একে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাছাড়া ফুলে মধু থাকলে ভোমরা গুনগুন করবেই। চন্দ্রাণীর রূপের আগুন তাই অনেক পুরুষকেই তাড়িত

করেছে, একটিবার দেখার আগ্রহে তাদের হৃদয় ভূষিত হয়ে রয়েছে। চন্দ্রাণী যদি শরীর সর্বস্ব নারী হত, তবে তার কামনার আগুন মেটাবার জন্য পুরুষের অভাব হত না। চন্দ্রাণীর দেহগত কামনা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে কোনভাবেই অবাধ না করে আশ্চর্য সংযমে নিজের লক্ষ্য স্থির করেছে সে-

"কুল লজ্জা অন্তস্পট করি নারী রহে।।
দক্ষিণ পবনে যেন শরীর না দহে
বৎসরের দুই বার যায় দেব স্থানে।
দেখে সুন্দর রূপ তপন নয়ানে।"

লোরের রূপ দেখে এই নারী একদিন আকুলিত হয়ে উঠল। এই আকুলতা স্বাভাবিক এবং চরিত্রানুগত। ময়নার সংযম প্রেমবোধ চন্দ্রাণী চরিত্রে প্রত্যাশা করা যায় না। স্বামীর সহবাসের ব্যর্থতা ময়নাকে তাড়িত করেনি, স্বামীর উপেক্ষা ও দূরে চলে যাওয়া তাকে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতীক করে তুলেছে। চন্দ্রাণীর যন্ত্রণা ও যাতনা ভোগ স্বামীর সঙ্গমজনিত অসামর্থে মানস সংঘটনের এই ভিন্নতাই এই দু'টি নারী চরিত্রকে ভিন্ন মেরুর করে তুলেছে। তাছাড়া চন্দ্রাণী যে অনেকটাই দেহগত ও সৌন্দর্যমগ্ন যা প্রকাশিত তার কামনা প্রতিহত আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে।

চন্দ্রাণীর রূপের মোহ ও কামনার সংযম চেষ্টাগত, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়। তাই লোরের রূপ মুহূর্তেই তাকে মুগ্ধ করে। এই দৃষ্টিকোণে চন্দ্রাণী রোমান্টিক নারী। যে কুলপ্লাবী লোর-আসক্তি এরপর চন্দ্রাণী চরিত্রে দেখা যায় তা কোন গৃহগতপ্রাণ নারীর মধ্যে সম্ভব নয়। নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করার সাহস, কামনার রাজ্যে পুরুষকে পতঙ্গবৎ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, বন্ধনমুক্তির অদম্য উৎসাহ, দেহযুক্ত রোমান্টিক প্রেমের জগতে হারিয়ে যাওয়ার যে বাসনা মানুষকে রোমান্টিক জগতের অধিবাসী করে তোলে তার সবকটি বৈশিষ্ট্যই চন্দ্রাণীর মধ্যে এরপর দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে একের পর এক দুঃসাহসিক কাজে সে নিয়োজিত। এই কাজে চন্দ্রাণীকে সাহায্য করেছে রতি বিলাসিনী রতিপণ্ডিত ধাই বুদ্ধিশিখা। এই বুদ্ধিশিখার পরামর্শেই দর্পণে নিজের মূর্তি দেখিয়ে লোরকে বিবশ করে দিয়েছে চন্দ্রাণী। তারপর যখন যোগিবেশী লোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনের সুযোগ এসেছে, তখন নিপুণ দুঃসাহসে রতিশাস্ত্রের সহজ স্বাভাবিকবোধে সুকৌশলে ছিঁড়ে ফেলেছে গলার হার। যে সময়ে সখীরা অমূল্য হার কুড়োতে ব্যস্ত, সেই দুর্লভ অবসরে প্রতিমার আড়াল থেকে লোরের সঙ্গে হয়েছে তার চোখের মিলন। এই নারী ময়নার মতো নয়। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা, সৌন্দর্য মোহগ্রস্ততা চন্দ্রাণীকে করে তুলেছে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের অধিবাসী। রোমান্টিকতার দুর্জয় সাহসে সমস্ত বিপদ বাধাকে উপেক্ষা করে চন্দ্রাণীই লোরকে মিলনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা সর্বগ্রাসী হয়ে চন্দ্রাণীকে এ কাজে তাড়িত না করলেও পছন্দসই পুরুষের সঙ্গে মিলনে নারী হয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় বিবেকের কোন তাড়না প্রতিহত করেনি তাকে। বরং রূপের মোহে অজস্র প্রতিকূলতা জয় করে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে রোমান্টিকতাই জয়যুক্ত হয়েছে এখানে। গোপন মিলনের শিখরস্পর্শী সে ছবি কবি আমাদের উপহার দিয়েছে।

"বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দুরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।

দোহ উন্মত্ত দোহ রসেতে দুজন।
কাম রসে রতি শাস্ত্রে দোহান বিদ্বান।
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।"

পুলক রোমাঞ্চিত দেহগত স্বাভাবিক মিলনের রোমান্টিকতা এই জাতীয় আচরণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। যা স্বাভাবিক মন যাকে চায় রোমান্টিকতার যাত্রা সেই পথেই। আদর্শের জন্য জীবনের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়াকে বলি দিতে রোমান্টিকতা চায় না। তাই মিলনেই শুধু নয়, আরো দূরে অভিযান শেষ নবীন মিলনও রোমান্টিকতা প্রত্যাশা করে। স্বামী থাকা সত্ত্বেও সাহসী পুরুষের সঙ্গে রহস্যরোমাঞ্চের পথে চন্দ্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু এই আকুলতায়। শুধু তাই নয়, পলায়ন যাত্রায়, বামনের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ্য নির্বাচিত পুরুষকে সার্থক প্রতিনিধি হয়ে সে উৎসাহিত করে। এই অংশে চন্দ্রাণী রোমান্টিক পুরুষের যোগ্য সহযাত্রী। কিন্তু চন্দ্রাণী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না নারীও বটে ক্রমাগত গোপন মিলন যে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং বীর বামন যে তাকে সমূলে বিনাশ করবে, চন্দ্রাণী এই আশঙ্কার কথা প্রণয়ী লোরের কাছে উত্থাপিত করে। কারণ লোরের সঙ্গে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা তার। কিন্তু লোর যখন বামনকে বিনাশের কথা বলে, সেই মুহূর্তে চন্দ্রাণীর বক্তব্যে শুধু সমাজসচেতনতাই নয়, অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-জানেরও প্রকাশ মেলে।

"করিব বৈরিতা যুদ্ধ বামনের সঙ্গে।
পৃথিবীতে তোমা নাম রহিব কলঙ্কে।।
লোকে খুযিন্তে রাজ সুতা দুষ্টা ছলে।
নিজকান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে।।"

উপপত্নী হিসেবে না থাকতে চেয়ে চন্দ্রাণী আত্মমর্যাদায় লোরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার আকাঙক্ষা প্রকাশ পরে। মধ্যযুগীয় রোমান্স ভাবনায় নয়, যেখানে অবিশ্বাস্য ভাবনা জড়িত, সেই চরিত্র পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়ে দৌলত কাজী চন্দ্রাণী চরিত্রে মিশ্রণ করেছেন পরিণত রোমান্টিকতার।

১১.৪.৩ লোর

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, 'সতীময়না'-কাব্যের রাজা-লোর বহুগামী পুরুষদের মধ্যে একজন । পতিব্রতা সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার রূপমোহ সেই এক কামোন্মত্ততারই দৃষ্টান্ত। দৌলত কাজীও লোরকে সেইভাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

"যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত
আচম্বিতে মতি হৈল লোরক নৃপতি।
ছাড়িয়া রতনহোর গুঞ্জাত আরতি।"

নিজ চরিত্রের এই ভোগাকাঙ্ক্ষার কারণেই স্ত্রী ময়নাকে পরিত্যাগ করে লোরের বনবিহার। স্বামীর এই জাতীয় মনোভাব ময়নার অজানা নয়। রূপ মুগ্ধ লোরের নারীপ্রীতির বিরোধিতা করা ময়নার পক্ষে

সম্ভব নয়। সেই সময় যখন রাজারাজড়াদের বিবাহিতা পত্নীরা থাকত অন্তঃপুরে; আর কামনা তাড়িত রাজারা সুন্দরী রমণীদের শরীরের আকর্ষণে ফেনিল উদ্দামতায় বর্ণময় জীবন অতিবাহিত করত। ময়নার স্বামী রাজা লোর এমন চরিত্রের। যার চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রী হয়েও ময়নাকে বলতে হয়।

"পুরুষ ভ্রমর
কঠিন কলেবর
অন্তরে বাহিরে কালী।
যাবৎ মত্তমতি
পুরি মনঃপ্রীতি
আর পুষ্পে করি কেলি।"

অবশ্য লোর চরিত্র আদ্যন্ত কামনালুব্ধ, ভোগবাদ সর্বস্ব পুরুষচরিত্র, এমন কথা বলা চলে না। রোমান্স জগতের অপর এক চরিত্র চন্দ্রাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে; দৌলত কাজী লোর চরিত্রের অন্য একটি দিক চিত্রিত করেছেন। যোগী প্রদর্শিত অসামান্য সুন্দরী চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখে রাজা লোরের কামনামদির চিত্তে গোহারি দেশে যাত্রা। এই আচরণকে চঞ্চলমতি পুরুষের আচরণ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তবে যে মুহূর্তে কবি নায়কের অভিসার যাত্রা করিয়েছেন, তাকে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুঃসাহসিক করে তুলেছেন, সেই মুহুর্তেই চরিত্রটিতে রোমান্টিকতার স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে। তারপর একের পর এক তার রোমান্টিক আচরণে স্থুল রুচির বৈশিষ্ট্য লঘু হয়েছে। অপরিচয়ের পথে যে বাধা আছে, এটা লোরের অজানা নয়। কিন্তু বীর শত বিপদ বাধাকে পেরিয়ে দূর দেশে অপেক্ষারত সৌন্দর্য প্রতিমার সঙ্গে মিলিত ব্যাকুল। প্রেমের এই সম্পর্কের মধ্যে পড়েছে রোমান্সের ছায়া। আর সেই কারণেই দুরন্ত সাহসে এবং গা ছমছমে ভীতির পরিবেশে সংঘটিত হয়েছে লোর-চন্দ্রানীর মিলন। এক্ষেত্রে রোমান্স জগতের অধিবাসী লোরের বীরমূর্তি-

"হাতে খড়া শোভে নেত ধরা পরিধান।
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।।
কুমারীর অন্তঃপুরে গেলা লোরর।
রোহিণী উদ্দেশে যেন গেলা নিশাকর।"

পুরুষের এমন বীরমূর্তি নারীর আরাধ্য। এদের জন্যই নারীরা মনে মনে দিবস রজনী অপেক্ষা করে। বীরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে এবং একজাতীয় রোমাঞ্চে এদের হাত ধরেই পথে বের হয়, চন্দ্রাণীও সুপুরুষ বীর লোরের সঙ্গে একদিন নিশ্চিত অবস্থান ছেড়ে যাত্রা করে অনিশ্চিতের পথে। এই পলায়নের পথেই বামনের সঙ্গে লোরের একটা গুরুতর যুদ্ধ হয়। এই অংশে বীর লোরই অঙ্কিত হয়েছে কাব্যে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষমতায় এবং কাঙ্ক্ষাত নারীকে অধিকার করার সোচ্চার ঘোষণায় বামনকে যে ভাষায় লোর আক্রমণ করেছে তাতে নারী ভোগের দুর্বার বাসনা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

"খর্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া!
পুরুষ উত্তম স্থানে ভেজে তার প্রিয়া।।
পুরুষ ভ্রমরা জাতি মধু যথা পায়।

সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায়।"

এমন পুরুষই সুন্দরী নারীকে অধিকারে নিয়ে আসতে; যোগীবেশ ধারণ করে। যদিও এই যোগীবেশ ধারণ বেশ একটা রহস্য রোমাঞ্চের পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তা সত্ত্বেও লোরের বিশ্বাস-অবিশ্বাস মাখা রোমান্টিক বীরত্বে দুর্বল কাপুরুষত্ব ছায়াবিস্তার করে, সে ব্যক্তিত্বময়ী চন্দ্রাণীর দ্বারা পরিচালিত হয় এখানে। চন্দ্রাণী যেমনটি চেয়েছে, বীর লোর সেই সেই কাজই করে গেছে। তবে সর্পদংশে সাময়িক অচৈতন্য এবং মৃত বলে মনে হওয়া চন্দ্রাণীর জন্য লোরের বিলাপ পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে।

"উঠ উঠ চন্দ্রমুখী কত নিদ্রা যাও।
মাধুরী সাদরে কেনে আমা না বোলাও।"

চকিত মুহূর্তে রোমান্টিক লোরের মধ্যে অন্য এক লোরের মূর্তি জেগে ওঠে। ময়না ও চন্দ্রাণী চরিত্রের মতো গতিশীলতা না থাকলেও, লোরের চরিত্র দৌলত কাজীর অভিনব সৃষ্টি।

১১.৪.৪ বামন

ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিহাস কোন কোন মানুষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপলাভ করে। বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সব মিলনে অতৃপ্ত মানুষের অসহায় বেদনাবোধ তখন ট্র্যাজেডির হাহাকারে আর্তনাদ করে। 'সতীময়না' কাব্যের এইরকম এক পুরুষ চরিত্র চন্দ্রাণীর স্বামী বামন। সে বীর, আর তার ট্র্যাজেডির সূত্রপাত ঠিক এখানেই। আবির্ভাবে এই চরিত্রের অসাধারণ বীরমূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন।

"দুর্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভুবন।
সমর ভূমিতে যেন সিংহের গমন।।
খপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ।
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস।"

গোহারি দেশের রাজা মোহরা এমন বীরের সঙ্গে অসাধারণ রূপবতী কন্যা চন্দ্রাণীর বিয়ে দেন। বিবাহ পরবর্তী অবস্থা বামনের জীবনে এবং বামন চন্দ্রাণীর দাম্পত্য সম্পর্কে মহাসঙ্কট ঘনিয়ে তুলে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এমন বীরই দাম্পত্য জীবনে এক অসহায় ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত জীবনের সম্মুখীন হয়। বামন নারী সহবাসে অক্ষম, একজন নপুংসক "রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।" পুরুষের পৌরুষত্বের এই অমর্যাদা, এমন অপমানিত রূপ ট্র্যাজেডির হাহাকার ছাড়া আর কী! তার অসহায় ব্যর্থতার জন্য বামন দায়ী নয়। অথচ সারা জীবন এর জন্য সে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, অপরের উপেক্ষা ও করুণার পাত্র।

"কামভাবে নারী প্রিয় না হয় বামন।।
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি।"

বামনের জীবনের নপুংসকতা এক চূড়ান্ত অভিশাপ। অপ্রত্যাশিত এই অভিশাপের আঘাতে তার জীবন তছনছ হয়ে গেছে। কবি বামনের এই বাহ্য বিপর্যয়ের ছবি আঁকেননি। কিন্তু তার অন্তরের ধ্বংসলীলা সুন্দরী স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার অনীহা এবং ক্রমাগত পলায়নপর মানসিকতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

নারী সহবাসে অক্ষমতা যে পুরুষের জীবনে কত বড় পরাজয়, কত বড় বেদনা তা বামন চরিত্রের হাহাকার না শুনলে অনুভব করা সম্ভব নয়। বিবাহিত নারী হিসেবে স্বামী মিলনের যে স্বপ্ন নারী চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে রাখে, সেই স্বপ্ন যদি নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙ্গে যায় তবে চাপা ক্রন্দন দোষাবহ নয়। কিন্তু সেই সীমাহীন পরাজয়ের মুখোমুখি পুরুষের আত্মযন্ত্রণার কোন তুলনা চলে না। পৃথিবীর সব রঙ এক নিমেষে তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায়, গ্লানির দহনে সমস্ত আকাশটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চন্দ্রাণীর এবং অন্যান্য মানুষজনের কাছে অসঙ্গত ঠেকে তখন বামনের
আচরণ।

"শাদুল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া।
বন ভ্রম আইসে যদি দুর্জয় বামন।
প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন।"

মিলনে অক্ষম বামনের এত ভিখারীর অবস্থা ! সচেতন মানুষ হিসেবে বামনের অজানা নয় যে, দেহই প্রেমের আধার। সেই শরীর যদি অতৃপ্ত থাকে তবে সেই অপরিতৃপ্ত কাম রহস্যময় করে তোলে প্রেমের প্রাসাদকে। দেহগত মিলনেই দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা জেনেও চন্দ্রাণীর সখীদের কথায় সংশয় সন্দেহের মধ্যেই চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্মতি জানায়। কারণ সুকৌশলে সখীরা জগতের একটি সার সত্য বামনের সামনে উপস্থিত করেছে।

"যৌবন কালেতে কনা বড় চিন্তা পায়।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ বিষ সর্বাঙ্গে বেড়ায়।
সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।
স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধি সুরতি।"

এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে বামনের এই সম্মতি প্রদান, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে স্ত্রী চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন কালে শারীরিক অক্ষমতায় তার অসহায় রূপ করুণ হয়ে ফুটে। চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে না চেয়ে বামন 'পশু প্রায়' নিদ্রা যায় এবং পরদিন।

"নিদ্রা হন্তে উঠি বীরে লৈল ধনুশার।
পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর।"

কবি চিত্রিত বামনের এই বীর পশু শিকার মূর্তির আসলে নারী সহবাসের অক্ষমতা জনিত ব্যর্থতা থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার উপায় মাত্র। আত্মধিক্কার এবং গ্লানির বোঝা নিয়ে এমন অবস্থায় কোন পুরুষেরই স্ত্রীর সামনে সহজ স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়।

প্রেমের আলোকে শারীরিক অক্ষমতার এই অসহায় রূপ হয়তো বামনের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু তার মনের মধ্যে এই সূক্ষ্ম প্রেমবোধেরও ভীষণ অভাব। শারীরিক খর্বতাই তাকে বামন করেনি, মানসিক অসংস্কৃতিও তার এই নামকে করে তুলেছে অর্থবহ। প্রেমের অনুভূতি বামনের মধ্যে না থাকায় চরিত্রটির মধ্যে একজাতীয় পশু-জনোচিত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্ত্রী চন্দ্রাণীকে বামনের এই আচরণও ভীষণভাবে পীড়িত করে।

"পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।

মুখ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।"

বামনের একমুখী চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ভিন্নাত্মক মাত্রা এই চরিত্রের সাহস ও বীরত্বে। স্ত্রী মিলনে সে অক্ষম, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়নকারী পুরুষের কাছে তার যাত্রা, সেই পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া পরিপূর্ণভাবে বীরত্বেরই প্রকাশ। বামনের বক্তব্যে যেমন, লোরের সঙ্গে যুদ্ধ ক্রিয়াতেও সেই এক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশিত।

"তেজময় তীক্ষ্ণ বাণে
বামন লোরকে হানে
মর্ম ভেদি প্রবেশে হৃদয়।
বামনের তীক্ষ্ম বাণে।
লোররাজ মর্মস্থানে
রক্তে বহে চারু কলেবর।"

এই চরিত্রটি দৌলত কাজীর অন্যতম সেরা সৃষ্টি। নারী মিলনে অক্ষমতা জনিত বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সেই সঙ্গে বীরত্ব ও ঔদার্যের প্রকাশে বামন চরিত্রকে বহুমাত্রিক রূপে গড়েছে।

১১.৪.৫ অন্যান্য চরিত্র

'সতীময়না' মূলত আখ্যানকাব্য। তাই নানারকম চরিত্রের উপস্থিতি এখানে প্রত্যাশিত। তাই মূল চারটি চরিত্র ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় চরিত্র এই কাব্যের বিন্যাসে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কবি প্রতিভার গুণে বেশ কয়েকটি চরিত্র আকর্ষণীয় এবং সার্থক হয়ে ফুটেছে।

১১.৪.৫.১ যোগী

মধ্যযুগীয় রোমান্স নির্ভর আখ্যানকাব্যের প্রেক্ষাপটে রাজা লোরের সামনে উপস্থিত যোগীর চরিত্রটি সুন্দর এবং বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী। যোগী চরিত্রের বর্ণনায় কবি দৌলত কাজী ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্যের উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন।

"জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম বিভূতি ভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন।
জলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগাসনে দহিছে সকল অভ্যন্তর।।"

যোগী সন্ন্যাসী চরিত্রগুলি রহস্যময় অলৌকিকতায়, একাধারে শ্রদ্ধাবোধ এবং অঘটন সংঘটনকারী চরিত্র হিসেবে প্রায়ই জনমানসে গৃহীত হয়। 'সতীময়না' কাব্যের যোগীর মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র নির্ভর রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। একটি রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে এই যোগীর আবির্ভাব ঘটে। ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্য সমৃদ্ধ এই যোগীর উদ্দেশ্যটি কিন্তু লঘু-তরল। তবে রোমান্সধর্মী আখ্যানকাব্যে এরকম নানা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। যোগী তার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলে গোহরা রাজ্যের রাজা মোহরার অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে চন্দ্রাণীর স্বামী বীর বামন, কিন্তু সে নপুংসক। মিলন কামনা প্রতিহত হওয়ার দুঃখে-অভিমানে চন্দ্রাণী

স্বামী বর্জিত সখী পরিবৃত অন্য এক স্থানে বাস করে। সুন্দরী রমণীর এমন অবস্থায় কামনালুব্ধ অনেক পুরুষের স্বাভাবিক আর্বিভাব ঘটবে। কিন্তু চন্দ্রাণী নিজেকে ভোগের রাজ্যে বিলিয়ে না দিয়ে সংযত জীবনই যাপন করে। আর বৎসরে দুই বার দেবস্থানে যায়। এমন মুহুর্তেই একদিন যোগীর চন্দ্রাণীর দর্শন ঘটে। এই অবসরে যোগীর সমাধি এবং সমাধিদর্শন বর্ণিত। সূফী ধর্মের সহজিয়া সাধনাই এই বিষয়ে প্রতিফলিত। বর্ণনাটি অপূর্ব সুন্দর।

"নয়ন মুদিয়া
পাতাল ভেদিয়া
দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি
জলে কূর্ম থাকি
কুর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে।"

এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য যোগী চরিত্রের স্বভাবানুসারী হওয়ায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটা ভারসাম্যে রক্ষিত। তবে যোগী চরিত্রে যতই তন্ত্রমন্ত্র, তন্ত্রাচার দর্শন কাজ করুক না কেন, যোগীর আসল চরিত্র বৈশিষ্ট্য সংযোগ সাধনকারীর। এই বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রটিকে মানিয়েছেও বেশ ভাল। চন্দ্রাণীর রূপের বর্ণনায় সে যে পুরোপুরি সফল, তার প্রমাণ যোগীর এই অসাধারণ বর্ণনায় সূত্র ধরেই লোরের গোহারি দেশে যাত্রা। রাজা লোরের সামনে সে বলেছে।

"স্ত্রী মধ্যে চন্দ্ররানি শচী কলাবতী।।
চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।"

যোগীর মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। তবুও মনে হয় চরিত্রটি রোমান্স জগতের জন্য আমদানীকৃত, প্রয়োজন সাধনকারী একটি চরিত্র।

১১.৪.৫.২ বুদ্ধিশিখা

একটা সময় ছিল যখন ধাত্রী বা ধাইদের সঙ্গে নবজাতক-জাতিকাদের একসময় প্রায় নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। পেশাগত নাড়ী ছেদন থেকে শুরু করে মাতৃ ও বন্ধু ভাবে শিশুদের লালন-পালনে ধাইদের ছিল এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা। সতীময়না'-কাব্যে ধাই বুদ্ধিশিখা চরিত্রে দৌলত কাজী এছাড়াও বিশেষ কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন।

"লোকপ্রিয়া সুতা জন চতুর সন্ধানী।
নির্জনে কুমারী সঙ্গে করি এক কেলি।
সময় গোয়ান্ত নানা কাব্য রস খেলি।"

মধুর বাক্যের সঙ্গে বুদ্ধির চাতুর্য্য, বন্ধুকৃত্যের সঙ্গে কাব্যরসাদির প্রতি অনুরাগ ধাই বুদ্ধিশিখা চরিত্রটিকে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়, এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছে। মাতৃসম স্নেহ এবং বন্ধুর মত ব্যবহারে চন্দ্রাণীর মনোদুঃখ জানার জন্য সে বলে।

"শিশু হতে তোকে মুই করিলু পালনা।

মায়েকে কেনে গুপ্ত মর্ম অন্তরে বেদনা।।
প্রথমে জর্মিলা যবে এই মহীতলে।
নাভি ছেদ তোমার করিলু কুতূহলে।।"

চন্দ্রাণীর কাছে শুধু ভালোবাসার দাবি জানায়নি বুদ্ধিশিখা, আরো এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় তার কথায়।

"সত্য কহ কাহাকে মজিল মন তোর।।
যদি হয় সিদ্ধা, বিদ্যাধর, সুরাসুর।
মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।"

অলৌকিক মন্ত্রশক্তির কথাই বলেছে ধাই বুদ্ধিশিখা। ধাই, বিন, ধোপানি, নাপিতানী প্রভৃতি শ্রেণির নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যযুগে বহুল পরিমাণে এই সব অতিপ্রাকৃত পরাবিদ্যার চর্চা লক্ষ করা যায়। বুদ্ধিশিখার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। রোমান্টিক রহস্যময়তার উপাদান বলা যেতে পারে এই মন্ত্রশক্তিকে। তবে মন্ত্রশক্তির অলৌকিকতায় নয়, বুদ্ধির চাতুর্য্যেই শেষপর্যন্ত বুদ্ধিশিখা রাজা লোরের সঙ্গে চন্দ্রাণীর মিলন সংঘটিত করেছে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিশিখা চরিত্রটি যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

১১.৪.৫.৩ রত্নামালিনী

'সতীময়না'-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রানি ময়নার দুঃখের মধ্যে দুষ্ট চরিত্রের রত্না মালিনীর প্রবেশ। জাগতিক চাহিদায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এক তিল সুখের জন্য লালায়িত এই রমনীরা আদ্যন্ত স্থূল রুচির। প্রেমের কিংবা কাজের মধ্যস্থতার কারণেই প্রাচীনকালে দূতি, কুট্টিনী অথবা মালিনীদের আবির্ভাব ঘটত। দৌলত কাজী মালিনীর মাধ্যমে এমন চরিত্রকে একেবারে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন।

"মালিনীর লাস ভেশ
কি কহিমু সবিশেষ
কুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।
মধুবস স্থল তুণ্ড
হৃদয় গরল কুণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক।"

কামনায় জর্জরিত একটি চরিত্র ছাতনকুমারের দৌত্যের ভূমিকায় তার আবির্ভাব, ময়নার বিরহ দশার মধ্যেও তা সে জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মালিনী ইতর, রুচিতায় স্থুল একথা যথার্থ, কিন্তু দেহবাদী এক বিশেষ দর্শন এই রমণীকে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দান করেছে।

"ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মায়।
চন্দ্র সূর্য অস্তংগতে পুনি উপি যায়।

যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়।
কৃপণের ধন যেন মূখের যৌবন।
কালের না খাইলে হয় শোকের ভাজন।"

ছলকলা এদের সহজাত, দেহবাদী দর্শনে এদের পুরোপুরি বিশ্বাস। মালিনী সম্পর্কে কবির উক্তি তাই— 'বেশ্যা-গুরু কুটনী প্রধান।'

সমগ্র বারমাস্যা জুড়ে সতী ময়নাকে কামনার পাঁকে টেনে নামানোর যে আপ্রাণ চেষ্টা মালিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তাতে একের পর এক সুকৌশলী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার তার অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথমে সে ময়নার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছে, অনুকুল প্রকৃতিতে শরীরের উত্তেজনাকে প্রশমিত না করে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত এমন ইঙ্গিত ময়নার মধ্যে মোহ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। আর এসব করতে গিয়ে ময়নার বক্তব্যে উঠে এসেছে, একমুখী কিন্তু অসাধারণ সমাজ জীবন দর্শন। সেগুলি প্রত্যেকটি যেন এক একটি মূল্যবান রত্ন।

"মোক্ষপদ কাম বর্গ ভুবন নিদান।
কামরসে মজিয়াছে পুরুষ প্রধান।
ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কাম কেলি।
রাধা সনে নিকুঞ্জ খেলায় বনমালী।"

এ ছাড়াও প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা, নারী মনস্তত্ব সম্পর্কে গভীর চেতনা, মালিনী চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

১১.৪.৫.৪ মিত্রকণ্ঠ

রাজা লোরের সারথী মিত্রকণ্ঠ। নামেই বোঝা যায়, সে শুধু রাজার সারথী নয়, তার বন্ধুও বটে। চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে রোমান্টিক যাত্রায়ও সে সঙ্গী, আবার চন্দ্রাণীর সঙ্গে গোপন মিলনের সময়েও তার ভূমিকা বন্ধুর সাহায্যকারী।

"মিত্রকণ্ঠ-বচন শুনিয়া নৃপবর।।
ক্ষেপিল বরশি পুনি ছানির উপর।
ছানি ভেদ রহে বর্ণি বলের প্রহারে।
সখীগণ বলে বর্শি খসাইতে নারে।"

রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে বন্ধুর যে ভূমিকা সেই একই অনুপ্রেরণায় মিত্রকণ্ঠ সারথী বামনের সঙ্গে রাজা লোরের যুদ্ধে সারথির সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার সর্পদংশনে তা চন্দ্রাণীর জন্য জীবনদায়ী বনৌষধি সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে মনে মনে অশ্রু সংবরণ করেছে। সমব্যথী উদার হৃদয়, বন্ধু না হলে তা কখনই সম্ভব হয় না।

"মিত্রকণ্ঠ সারথি ভাবে মনে মনে।
অবশ্য মরিব লোর কুমারী কারণে?
লোররাজ বিনু আমি ত্যজিব জীবন।
দৈববলে এক বিষে তিনের নিধন।।"

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে চন্দ্রাণীর পিতা সাধারণ পিতার মতোই সন্তানের সুখে দুঃখে অনুভূতিপ্রবণ সমব্যথী। দৈবপুরুষ সম্পূর্ণ অর্থেই অলৌকিক জগতের অধিবাসী।

নারদ মুনি ও অঙ্গিরা চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। মুনি হয়েও সুন্দরের মোহ যেভাবে তাদের পীড়িত করেছে, তাতে কামনা জর্জর বাস্তব মানুষ বলেই মনে হবে। রাজকন্যা সম্পর্কে অঙ্গিরার ভাবনায় সেই দৃষ্টির ছায়াপাত।

"রূপ দেখি কল্পয় অঙ্গিরা বনবাসী।
পত্ররস চর্বে যেন দরিদ্র উপাসী।"

রতনকুমার ইতর কামুক প্রকৃতির চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি। রাজপুত্র স্বর্ণষ্ঠীব একেবারেই অলৌকিকতা মাখা রোমান্স জগতের বাসী।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। লোর চরিত্র আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
২। চন্দ্রাণী চরিত্র আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
৩। ময়না চরিত্র আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
৪। যোগী চরিত্র আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৫ কবি কৃতিত্ব

মানুষ জীবনের সূচনা থেকেই প্রেমের সম্পর্কের অধীন। প্রেমের চিরন্তন স্বরূপই মূলত এর প্রধান কারণ। নায়ক-নায়িকার জীবনে কখনও প্রেম কখনও অমৃতময়, আবার কখনও প্রেমের গরল জীবনকে বিষের জ্বালায় জর্জরিত করে। অবশ্য এই দুইয়ে মিলেই প্রেমের স্বর্গীয় স্বরূপ প্রকাশ পায়। আবার দাম্পত্য জীবনেও রয়েছে প্রেমের অন্য স্বাদ। আদর্শ পুরুষরা যেমন স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করে না তেমনি আদর্শ নারীরাও একগামী থাকে। এক্ষেত্রে নারীদের সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারটা সংসার জীবনের স্থায়ীত্ব রক্ষায় পালন করে প্রধান ভূমিকা। এই বিষয়টিই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যে।

যে কবি সর্বপ্রথম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মকে বাদ দিয়ে বাস্তব পৃথিবীর মানুষের কথাকে নিজের রচনায় স্থান দিলেন তিনি আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভার কবি দৌলত কাজী। তিনি আরাকান রাজ থিরি-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মার) শাসনকালে (১৬২১-১৬৩৮) রাজার সভাসদ আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে ১৬২২-১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে একজন হিন্দি কবির ঠেট-গোহারী (গ্রাম্য হিন্দি) ভাষায় রচিত 'ময়না কো সত্' কাব্য অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' কাব্যটি রচনা করেন। তবে দৌলত কাজী এই কাব্যটি সম্পূর্ণ শেষ করে যেতে পারেন নি, পরবর্তী সময়ে (১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে) কাব্যটির বাকি অংশ লিখে সমাপ্ত করেন কবি সৈয়দ আলাওল।

একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দৌলত কাজী হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার, জীবনাদর্শের মতো নানা তথ্যকে যেভাবে এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আসলে কবির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দুধর্মের মানুষ। অতএব 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না'র মতো রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখতে বসে তিনি যে পূর্ববর্তী সময়ের হিন্দুর বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত রোম্যান্টিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, তা স্বীকার করতে হবে। মনে হয় বৈষ্ণব ধর্ম নয়, পদাবলি সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ভাব-ঐশ্বর্যই দৌলত কাজীর মনকে মুগ্ধ করেছিল অতিমাত্রায়। একথা মেনে নিতে হয় যে দৌলত কাজী একজন মর্ত্যভূমির জীবনরসিক কবি। এরজন্য কাব্যটির কাহিনি পরিকল্পনায় ও চরিত্রের মন-মনন-মেজাজ-মানসিকতার টানাপোড়েন উদঘাটনে কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা এক পথ।

১১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে লোরচন্দ্রাণীর গুরুত্ব অপরিসীম। রাজা লোর ও চন্দ্রাণীর মানবিক প্রেম কাহিনিকে মননশীল শিল্প চেতনায় বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বাতাবরণে দৌলত কাজীর এহেন বিপ্লবী সাধনা সত্যিই সাধুবাদ জানাতে হয়। আরাকান রাজসভার কবি সম্প্রদায়ের উপর যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের নির্ভর যোগ্য ছত্রছায়া ছিল তাই তাঁরা এই ধর্মীয় পরিমণ্ডের বাইরে গিয়ে কাব্য লেখা পথ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন।

১১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- আরাকান সাহিত্যের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- সপ্তদশ শতকের কাব্য হওয়া সত্ত্বেও মানব প্রেমের কাহিনি যে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে পারলাম।
- কবি দৌলত কাজীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

১১.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড.দেবেশ কুমার (২০১০); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) , কলকাতা , ইউনাইটেড বুক এজেন্সী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭); আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (১৯৮৫); রাজ সভার কবি ও কাব্য; কলকাতা, পুস্তক বিপুণী

১১.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: কাব্যটির কাহিনি সংক্ষেপ এরকম - গোহারী দেশের রাজা মোহরা। ..... চন্দ্রাণী বীর্যশালী বামনের স্ত্রী, কিন্তু বামন নপুংসক হওয়ার কারণে কামকেলিতে অসমর্থ .....–বামনের সঙ্গে রাজা লোরকের যুদ্ধ, বামনের পরাজয় ও মৃত্যু। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, সতীময়না'-কাব্যের রাজা-লোর বহুগামী পুরুষদের মধ্যে একজন ।..... তারপর একের পর এক তার রোমান্টিক আচরণে স্থুল রুচির বৈশিষ্ট্য লঘু হয়েছে। ..... চকিত মুহূর্তে রোমান্টিক লোরের মধ্যে অন্য এক লোরের মূর্তি জেগে ওঠে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: সূফী প্রেমের আদর্শ দৌলত কাজীকে প্রেরণা যুগিয়েছে দেহ ও দেহাতীত প্রেমের সমন্বয় সাধনে।..... 'সতীময়না' কাব্যে চন্দ্রাণী চরিত্রটি পরপুরুষের ভোগের সামগ্রী না হয়ে নিজের অতৃপ্ত যৌবন বাসনার প্রচণ্ড তাগিদে ভোগের রাজ্যকে নিজেই ডেকে এনেছিল। .....লোরের রূপ দেখে এই নারী একদিন আকুলিত হয়ে উঠল। এই আকুলতা স্বাভাবিক এবং চরিত্রানুগত।..... -সেই চরিত্র পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়ে দৌলত কাজী চন্দ্রাণী চরিত্রে মিশ্রণ করেছেন পরিণত রোমান্টিকতার।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: এই কাব্যে সতীত্বের আদর্শপুষ্ট চরিত্র ময়না।..... কল্যাণময়ী প্রেমের প্রতীক এই নারীর আচারে-ব্যবহারে সংসারে শ্রী ও মঙ্গল বিরাজ করে।..... সতীময়না'-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ময়নাকেই বিরহের আগুনে পুড়িয়ে কবি যোগিনীরূপে অঙ্কন করেছেন।..... সত্য বিশ্বাস ও অবিচল প্রতীক্ষার প্রতিমূর্তি ময়না মাঝে মাঝেই কম্পিত হয়েছে দেহের তাড়নায়।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৪। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মধ্যযুগীয় রোমান্স নির্ভর আখ্যানকাব্যের প্রেক্ষাপটে রাজা লোরের সামনে উপস্থিত যোগীর চরিত্রটি সুন্দর এবং বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী।..... এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য যোগী চরিত্রের স্বভাবানুসারী হওয়ায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটা ভারসাম্যে রক্ষিত। .....তবুও মনে হয় চরিত্রটি রোমান্স জগতের জন্য আমদানীকৃত, প্রয়োজন সাধনকারী একটি চরিত্র।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

⑦ ১১.১০ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১। লোরচন্দ্রাণীর কাহিনির পরিচয় প্রদান করুন।

২। চরিত্র নির্মাণে দৌলত কাজীর প্রতিভার পরিচয় দিন।

৩। দৌলত কাজীর কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৪। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' কাহিনিতে মানব প্রেম যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করুন।

*** *** ***